তৈরি পোশাক শিল্পে পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা

ফারুক রায়হান, অর্থনীতিবিদ

ভারতীয় উপমহাদেশে টেক্সটাইল শিল্পের ইতিহাসে যে ক' জন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম জানা যায় তাদের মধ্যে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার কুষ্টিয়ার মোহন চক্রবর্তী অন্যতম। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তাঁর হাতে টেক্সটাইল শিল্পের গোড়াপত্তন হয়।১৯০৮ সালে কুষ্টিয়া শহরের গড়াই নদীর তীরে একশো একর জমির ওপর তিনি একটি টেক্সটাইল মিল চালু করেন। নাম দেন মোহিনী মোহন মিলস্ এন্ড কোম্পানি লিমিটেড। এই মিলটি এক সময় এশিয়ার সর্ববৃহৎ টেক্সটাইল মিলের স্বীকৃতি পেয়েছিল। মিলটিতে তখন কম বেশি তিন হাজার মানুষ কাজ করতো।

এরও পূর্বে ব্রিটিশ আমলের বহু আগে থেকেই এ জনপদে হাতে বোনা কাপড়ের সুখ্যাতি ছিলো। আরব ও ইউরোপীয় বণিকদের কাছে ছিল এর ব্যাপক চাহিদা। বাংলা ও এর আশপাশের এলাকায় সুলতানি আমলে হাতে বুনা কাপড়ের উৎকর্ষতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এ শিল্পটি তৎকালীন 'বসাক' সম্প্রদায়ের হাত ধরে গড়ে উঠেছিল। এ সম্প্রদায়ের মূল আবাস ভূমি ছিল সিন্ধু উপত্যকার অববাহিকায়। কালের পরিক্রমায় তারা সেই স্থান ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে এসে বসবাস শুরু করে। আবহাওয়ার প্রতিকূলতার কারণে সেখান থেকে তারা রাজশাহী অঞ্চলে চলে আসে এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে পাবনা, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লাসহ অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁতের কাজ শুরু করে। তখনকার সময়ে যারা তাঁতশিল্পের সাথে জড়িত ছিল অর্থাৎ মুসলিম তাঁতিদেরকে 'জোলা' বলা হতো। 'জুলা' শব্দটি এসেছে ফরাসি ' জুলাহা্' থেকে,যার অর্থ তন্তুবায় অর্থাৎ সুতা তৈরি করা থেকে শুরু করে কাপড় বোনার কাজ করতো। ঢাকার মসলিনের কথা কে না জানে। মোগল সম্রাটদের অন্দরমহল থেকে শুরু করে ইউরোপীয় এলিটদের কাছে এর কদর ছিলো আকাশছোঁয়া। পর্যটক ইবনে বতুতার কথা আমরা কম বেশি সবাই জানি, যিনি চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি বাংলা ভ্রমন করেন। তিনি তৎকালীন ঢাকার কাছে সোনারগাঁওয়ের মসলিন দেখা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।প্রথম শতকে রচিত 'পেরিপ্লাস অব দ্যা এরিথিয়ান সি' গ্রন্থে মসলিন সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। এ সময় রোম সাম্রাজ্যের অভিজাত রোমান নারীরা মসলিন ব্যবহার করতেন। এ গ্রন্থে তিন ধরনের মসলিনের উল্লেখ রয়েছে। একটু মোটা ধরনের মসলিনকে মলোচিনা,প্রশস্ত ও মসৃণ মসলিনকে মোনাচি এবং সর্বোৎকৃষ্ট মসলিনকে গেনজিটিক বা গঙ্গাজলী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মসলিন ছিলো ৪০ হাত লম্বা ও দুই হাত চওড়া। এ সব মসলিন দিয়ে রাজকীয় পোশাক তৈরি করা হতো।ইতিমধ্যে তিনটি শিল্প বিপ্লব আমারা পার করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করলেও সেই আমলের মসলিন আমরা আজও তৈরি করতে পারিনি। তবে আশার কথা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ আগ্রহে মসলিন পুনরুদ্ধারের জন্য একটি প্রকল্প সরকার বাস্তবায়ন করছে, যার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই আদি মসলিনের প্রায় কাছাকাছি কাউন্টের সুতা ও কাপড় তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই মসলিন পুনরুদ্ধার প্রকল্পে বুটেক্সের টেক্সটাইল ইনি্জনিয়ারিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড.শাহ আলিমুজ্জামান বেলাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে পুরান ঢাকার উর্দু রোডে রিয়াজ স্টোরের যাত্রা শুরু হয়। শুরুতে এখানে টেইলারিংয়ের সুবিধা ছিল। সে সময় এটির সুনামও ছিল। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৩ সালে এটির নাম পাল্টে রাখা হয় রিয়াজ গার্মেন্টস। প্রথম দিকে এই গার্মেন্টসের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় মার্কেটগুলোতে বিক্রি হতো। এরপর এ গার্মেন্টসের পণ্য বিদেশে রপ্তানি শুরু হলে দেশের ব্যবসায়িদের মধ্যে নতুন এই ব্যবসা নিয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।সেই থেকে শুরু। বাংলাদেশের গার্মেন্টস ব্যবসায়িদের আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।বিভিন্ন সময়ে নানা রকম ঝড়-ঝঞ্ঝা আসলেও দক্ষতার সাথে আমাদের গার্মেন্টস ব্যবসায়িরা সেগুলো সামাল দিয়েছে।রিয়াজ গার্মেন্টসের হাত ধরে চলা এই পোশাক রপ্তানি এরই মধ্যে বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়তে উন্নতি ঘটছে। ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে ভালো করছে। আমরা অনেকেই হয়ত জানি বা জানিনা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন বাংলাদেশের তৈরি ডেনিম জিনস প্যান্ট ব্যবহার করে। আর ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রতি তিনজনে একজন বাংলাদেশের তৈরি টি-শার্ট ব্যবহার করে। এটি বাংলাদেশের জন্য গর্বের। ২০২১-২২ অর্থ বছরে বিদেশে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৪২.৬১বিলিয়ন মার্কিন ডলারের, যা মোট রপ্তানির ৮১.৮১ শতাংশ। দেশের জিডিপির কম বেশি ১১ শতাংশ আসে পোশাক শিল্প থেকে। তৈরি পোশাক রপ্তানির বিশ্ববাজারের প্রায় ৮ শতাংশ স্থান দখল করে আছে বাংলাদেশ। এর অর্থ বিশ্ববাজারের আরও বেশি অংশ করায়ত্ত করার বিশাল সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের সামনে।২০৩০ সালের মধ্যে পোশাক রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এশিল্পে কর্মসংস্থান হয়েছে কম বেশি ৪০ লাখ মানুষের । এর মধ্যে কম বেশি ৭০ শতাংশ মহিলা।পরোক্ষভাবে কম বেশি ৫ কোটি মানুষ এ শিল্পের ওপর নির্ভরশীল।

প্রতিযোগিতা মূলক বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশ দক্ষতার সাথে তার অবস্থান ধরে রেখে নতুন নতুন বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করছে। গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পণ্যের মান ও ডিজাইন আধুনিক করার পাশাপাশি ক্রেতাদের রুচি এবং তাদের ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে গবেষণার মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে রপ্তানি বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা হচ্ছে। পোশাক শিল্পের হাত ধরেই দেশের অর্থনীতিতে এসেছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। শ্রমঘন এ শিল্পের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ,কর্মসংস্থান ও নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ের সুবিধা বঞ্চিত নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে।

বাংলাদেশে গার্মেন্টসের সবুজ কারখানা রয়েছে ১৯২ টি।বিশ্বে বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি সবুজ গার্মেন্টস কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে ৬৮টি প্লাটিনাম, ১১০ টি গোল্ড, ১০ টি সিলভার এবং চারটি কারখানা এখনো কোন রেটিং পায়নি।বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ দশ কারখানার আটটি বাংলাদেশের। আর শীর্ষ একশ পরিবেশবান্ধব কারখানার ৫৩ টি বাংলাদেশের।অপর দিকে বিশ্বের শীর্ষ গার্মেন্টস রপ্তানিকারক দেশে চীনে আছে মাত্র ১০ টি পরিবেশবান্ধব কারখানা। ২০১২ সালে প্রথম পরিবেশবান্ধব গার্মেন্টস কারখানার যাত্রা শুরু হয় পাবনার ঈশ্বরদী ইপিজেডের' ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও' এর মাধ্যমে। এছাড়াও আরও ৫৫০ টি গার্মেন্টস কারখানাকে পরিবেশবান্ধব কারখানায় রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ চলছে। সাধারণত অন্যান্য গার্মেন্টসের চেয়ে পরিবেশবান্ধব গার্মেন্টসের খরচ ৫-২০ শতাংশ বেশি হয়ে থাকে। গত চার দশকে একটি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করার পেছনে সরকারের নীতি এবং শিল্পের অভাবনীয় বিকাশ কাজ করছে। দেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে অব্যাহত অবদান রাখার পাশাপাশি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত, শ্রমিকের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং পরিবেশবান্ধব সবুজ শ্রমঘন শিল্প হিসাবে গার্মেন্টস সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় পরিবেশ ও জলবায়ুর বিষয়গুলিকে বিদেশী বায়ার অর্থাৎ তৈরি পোশাকের বিদেশি ক্রেতারা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। ফলে দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখা এবং সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব কারখানা তৈরির বিকল্প নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের United States Green Building Council (USGBC) ১৯৯৯ সাল থেকে কোন স্থাপনার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে। চারটি ক্যাটাগরিতে এই সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এই সার্টিফিকেশন প্রসেসের মধ্যে ১১০ পয়েন্টকে ৭ ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো ভৌগোলিক অবস্থান যার পয়েন্ট হলো ২৬, পানি সাশ্রয় যার পয়েন্ট ১০, প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার এর পয়েন্ট ৩৫,পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রীর জন্য ১৪, অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত অবস্থার জন্য ১৫, অতিসাম্প্রতিক উদ্ভাবন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ৬ পয়েন্ট এবং এলাকাভিত্তিক প্রাধান্যের জন্য ৪ পয়েন্ট রয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে সবগুলো ইন্ডিকেটর মিলে ৪০-৪৯ পেলে প্রতিষ্ঠানটি সার্টিফাইড। ৫০-৫৯ পয়েন্ট পেলে সিলভার, ৬০-৬৫ পয়েন্ট পেলে গোল্ড সার্টিফিকেট এবং ৭০-৮০ বা এর বেশি পয়েন্ট পেলে প্লাটিনাম সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

উৎপাদনের সাথে পরিবেশের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে পরিবেশ দূষণও বৃদ্ধি পায়।এ জন্য বলা হয় উৎপাদন ও বন্টনের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক নেতিবাচক। কিন্তু উৎপাদন ও বন্টন ছাড়া বর্তমান পৃথিবী অচল।তাই পরিবেশের প্রধান তিনটি উপাদান বায়ু,মাটি ও পানির দূষণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখে উৎপাদন ও বন্টন তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখতে হয়।এ জন্যই এসডিজি -তে উল্লেখ করা হয়েছে Minimum Development, maximum sustainable output অর্থাৎ আগামীর ক্ষতি না করে বর্তমানের সর্বোচ্চ উন্নয়ন করাই SDGs মূল লক্ষ্য। পোশাক শিল্প অতীতেও আমাদের এ ভূখন্ডে ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে যুক্ত করে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি পোশাক অধিক হারে রপ্তানির সুযোগ আছে।

#

পিআইডি ফিচার